ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘সরকারি ক্রয়ে সুশাসন: বাংলাদেশে ই-জিপি’র কার্যকরতা পর্যবেক্ষণ’ প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: বিশ্বব্যাপী সরকারি খাতে সরকারি ক্রয় দুর্নীতির অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত। এই খাতে দুর্নীতির জন্য বিশ্বব্যাপী বছরে কমপক্ষে ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়, যার প্রাক্কলিত অর্থনৈতিক ক্ষতি বার্ষিক জিডিপি’র ১.৫% এরও বেশি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় বাংলাদেশেও সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সরকারি খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর সম্পন্ন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর গবেষণায়ও সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতির ফলে বাজেটের একটি বড় অংশের ক্ষতি (৮.৫% থেকে ২৭%) পরিলক্ষিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি ২০৩০) “জাতীয় নীতি ও অগ্রাধিকার অনুসারে টেকসইযোগ্য সরকারি ক্রয়কে উৎসাহিত করতে হবে” বলে উল্লেখ করা হয়েছে (লক্ষ্য ১২.৭)। এছাড়া জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনেও প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকে দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য স্বচ্ছতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নৈর্ব্যক্তিক শর্তবিশিষ্ট সরকারি ক্রয়কাঠামো প্রবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘ ও কনভেনশনের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে উপরোক্ত শর্ত পূরণে বাংলাদেশও অঙ্গীকারবদ্ধ।

২০২১ সালের মধ্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা ডিজিটাল করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১১ সালের ২ জুন থেকে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে ‘সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট’ (সিপিটিইউ) ই-জিপি পোর্টাল চালু করে। বাংলাদেশে ই-জিপি প্রবর্তনের প্রায় একদশক পর ই-জিপি’র প্রয়োগ ও কার্যকরতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কোন মাত্রায় ই-জিপি’র চর্চা করছে, সরকারি ক্রয়ের ধরন ও প্রকৃতি বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা, সব সরকারি প্রতিষ্ঠান সব ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি ব্যবহার করে কিনা, ই-জিপি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী, ই-জিপি প্রবর্তন করার ফলে সুশাসনের ক্ষেত্রে কোনো গুণগত পার্থক্য বা উন্নতি হয়েছে কিনা, এর ফলে দুর্নীতি বা অনিয়ম কমেছে কিনা, এবং প্রাপ্ত পণ্য, সম্পাদিত কাজ বা গৃহীত সেবার মানের কোনো উন্নতি হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো জানার জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি প্রবর্তনের পর থেকে সরকারি ক্রয়ে গত নয় বছরে এসকল ক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তার ওপর বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান। টিআইবি দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত, প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে ই-জিপি’র প্রয়োগ ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করে টিআইবি এ গবেষণাটি সম্পন্ন করেছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এ গবেষণাটির প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সরকারি ক্রয় খাতে সুশাসনের আঙ্গিকে ই-জিপি’র প্রয়োগ ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্রয় আইন ও বিধি অনুযায়ী ই-জিপি কতটুকু অনুসরণ করা হয় তা চিহ্নিত করা;
- ই-জিপি যথাযথভাবে অনুসরণ না হলে তার কারণ অনুসন্ধান করা;
- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি’র কার্যকরতা পর্যালোচনা করা; এবং
- ই-জিপি’র প্রয়োগে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় ই-জিপি বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, ই-জিপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, ই-জিপি ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং কার্যকরতা - এই পাঁচটি ক্ষেত্রের অধীনে ২০টি নির্দেশকের ভিত্তিতে ই-জিপি বাস্তবায়নকারী প্রথম দিকের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), এবং পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) - এই চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ক্ষেত্রের অন্তর্গত নির্দেশকসমূহ হচ্ছে আর্থিক সক্ষমতা, ভৌত সক্ষমতা, কারিগরি সক্ষমতা, মানবসম্পদ, ই-জিপি’র ব্যবহার, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ও ক্রয় সীমা। ই-জিপি প্রক্রিয়া ক্ষেত্রের অধীনের নির্দেশকসমূহ হচ্ছে ই-জিপি’তে নিবন্ধন, টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া, প্রাক টেন্ডার মিটিং, ই-বিজ্ঞাপন, দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ই-জিপি ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রটির অন্তর্গত দুইটি নির্দেশক হচ্ছে ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ক্ষেত্রটির অধীনে অভিযোগ নিষ্পত্তি, নিরীক্ষা ও কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ, এবং কার্যকরতা ক্ষেত্রটির অধীনে অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং কাজের মান এই দুইটি নির্দেশক পর্যালোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'ট্রাফিক সিগন্যাল পদ্ধতি' ব্যবহার করে উপরোল্লিখিত চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি বাস্তবায়নের অবস্থা পাঁচটি ক্ষেত্রের অধীনে ২০টি নির্দেশকের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক নির্দেশককে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন স্কোর দিয়ে তাদের অবস্থান বোঝানো হয়েছে, যা তিনটি রংয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্ব-নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে প্রত্যেক নির্দেশকের স্কোর দেওয়া হয়েছে ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বনিম্ন যে পর্যন্ত ক্রয় করার অনুমোদন রয়েছে সেই পর্যায় পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সুবিধাজনক নমুনায়নের মাধ্যমে সারা দেশে চারটি প্রশাসনিক বিভাগের একটি করে জেলা এবং সে জেলার একটি উপজেলা পর্যায়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবস্থিত কার্যালয় ও ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এভাবে চারটি প্রতিষ্ঠানের মোট ৫২টি কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার ও দলগত আলোচনা ব্যবহার করা হয়েছে, এবং তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ক্রয় বিশেষজ্ঞ, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঠিকাদার, এবং সংবাদ-মাধ্যম কর্মীদের সাথে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও নিবিড় সাক্ষাৎকার (মোট ১৭৭ জনের) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর দলগত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পরোক্ষ উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ, প্রাতিষ্ঠানিক বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, এবং ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণায় কিভাবে স্কোরিং করা হয়েছে?

উত্তর: প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, ই-জিপি প্রক্রিয়া, ই-জিপি ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং কার্যকরতা - এই পাঁচটি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের মোট স্কোর পাওয়ার জন্য ঐ ক্ষেত্রের সবগুলো নির্দেশকের স্কোর প্রথমে যোগ করা হয়েছে। এরপর ঐ ক্ষেত্রে যতগুলো নির্দেশক রয়েছে তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে এর শতকরা হার বের করা হয়েছে। যেমন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা- এই ক্ষেত্রটির অধীনে সাতটি নির্দেশক রয়েছে। ধরা যাক, একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য এই ক্ষেত্রটির নির্দেশকগুলোর মোট স্কোর ৮ (দুইটি নির্দেশক ২ করে, চারটি নির্দেশক ১ করে এবং একটি নির্দেশক ০ পেয়েছে)। এই ক্ষেত্রের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোর ১৪ (৭টি নির্দেশক X প্রত্যেক নির্দেশকের সর্বোচ্চ স্কোর ২ ধরে)। কাজেই প্রথম ক্ষেত্রের চূড়ান্ত স্কোর ৮/১৪ X ১০০ = ৬০%। কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক স্কোর পাওয়ার জন্য সবগুলো নির্দেশকের মোট সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত মোট স্কোরের শতাংশ হিসাব করা হয়েছে। যেমন, কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মোট স্কোর ১৭ হলে মোট স্কোর হবে ১৭/৪০ X ১০০ = ৪২%। সবশেষে সার্বিক স্কোরকে কয়েকটি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে, এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের স্কোর অনুযায়ী গ্রেড দেওয়া হয়েছে। স্কোরের গ্রেডগুলো হচ্ছে 'ভালো' (৮১% বা তার বেশি); 'সন্তোষজনক' (৬১%-৮০%); 'ঘাটতিপূর্ণ' (৪১%-৬০%); 'উদ্বেগজনক' (৪০% বা তার নিচে)।

প্রশ্ন ৬: এই গবেষণায় কোন সময়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে?

উত্তর: ২০১৯ সালের জুলাই থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা এবং সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিভিন স্তর ও পর্যায়সহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই (ট্রায়াঙ্গুলেশন) করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যসমূহের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় স্বীকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এবং নথিও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ কী কী?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ হচ্ছে–

- সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি'র প্রবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও এখনো সব প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয়ে এর ব্যবহার হচ্ছে না, ই-জিপি'র ব্যবহার এখনো ক্রয়াদেশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ;
- দুর্নীতি হ্রাস ও কাজের মানের ওপর ই-জিপি'র কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না;
- ক্রয় প্রক্রিয়া সহজতর হলেও কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ, সিন্ডিকেট এখনো কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে;
- ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে ম্যানুয়াল থেকে কারিগরি পর্যায়ে সরকারি ক্রয়ের উত্তরণ ঘটলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একাংশ দুর্নীতির নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে;
- কার্যাদেশ বিক্রি, অবৈধ সাব-কন্ট্রাক্ট, কাজ ভাগাভাগির কারণে কাজের মানের ওপর কোনো ইতিবাচক প্রভাব নেই;
- ই-জিপি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো কোনো কোনো কাজে ম্যানুয়াল পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল - ফলে ই-জিপি'র মূল উদ্দেশ্য (অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, নিরপেক্ষ মূল্যায়ন) অনেকখানি ব্যাহত হচ্ছে; এবং
- বিদ্যমান এই সকল সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ ঘটলে ই-জিপি'র সুফল পুরোপুরি পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রধান সুপারিশ কী কী?

উত্তর: এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিম্নের সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হয়েছে-

১. ই-জিপি'কে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ ও সিন্ডিকেটের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করতে হবে; সেই লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও জনগুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে অবস্থিত ব্যক্তির রাষ্ট্রের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবসায়িক সম্পর্কের সুযোগ বন্ধ করতে হবে;

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

২. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে করতে হবে;
৩. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতে তৈরি করতে হবে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;
৪. ই-জিপি পরিচালনার জন্য কাজের চাপ ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে জনবল বাড়াতে হবে;
৫. ই-জিপি'র সাথে সম্পর্কিত সব অংশীজনকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে; নির্দিষ্ট সময় পর পর ঠিকাদার, ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে;

ই-জিপি প্রক্রিয়া

৬. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে প্রাক-দরপত্র মিটিং নিশ্চিত করতে হবে;
৭. ঠিকাদারদের একটি অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে যেখানে সকল ঠিকাদারের কাজের অভিজ্ঞতাসহ হালনাগাদ তথ্য থাকবে; কাজের ওপর ভিত্তি করে ঠিকাদারদের আলাদা শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে, যা সঠিক ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে;
৮. সিপিটিইউ-এর পক্ষ থেকে একটি সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় দরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকতে হবে যা সব সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করবে;

ই-জিপি ব্যবস্থাপনা

৯. সিপিটিইউ-এর পক্ষ থেকে ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি ই-জিপি'র অধীনে শুরু করতে হবে;

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকরতা

১০. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী নিরীক্ষা করাতে হবে;
১১. দরপত্র সংক্রান্ত সব তথ্য ও সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের জন্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে;
১২. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি'র সাথে জড়িত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের আয় ও সম্পদের বিবরণী প্রতিবছর শেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে ও তা প্রকাশ করতে হবে; এবং
১৩. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে তদারকি করতে হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ (কমিউনিটি মনিটরিং) থাকতে হবে।

প্রশ্ন ১০: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও ফলাফল গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসহ অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

---